সংখ্যা ৩৭-৩৮ ।। ১৪২২-২৩ আইএসএসএন-১৫৬০-৭৫৮৫

ইতিহাস সমিতি পত্রিকা

বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি

Scanned by CamScanner

ইতিহাস সমিতি পত্রিকা

সংখ্যা ৩৭-৩৮ ১৪২২-১৪২৩

মো. শাহিনুর রশীদ
আরডিএ, বগুড়া
০৮.১২.১৭

বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি

Scanned by CamScanner

ইতিহাস সমিতি পত্রিকা
বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি-র দ্বিবার্ষিক পত্রিকা
সংখ্যা ৩৭-৩৮ ১৪২২-১৪২৩, ২০১৫-১৬
আই এস এস এন ১৫৬০-৭৫৮৫

প্রকাশ কাল : অগ্রহায়ণ ১৪২৪/ ডিসেম্বর ২০১৭

লেখকগণ তাদের প্রবন্ধে যে সকল মন্তব্য বা মতামত প্রকাশ করেছেন তার জন্য সম্পাদনা পরিষদ দায়ী নন।

মুদ্রণে :
বেঙ্গল কম-প্রিন্ট
৬৫/৫, গ্রীণ রোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬১১১৪২, ০১৭১৩-০০৯৩৬৫

মূল্য : ১৫০/- টাকা (বাংলাদেশ)
U.S. $ 2.00 (বিদেশে)

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

ইসলাম ও ইতিহাস ১

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

প্রাচীন বাংলার জননিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা ১৫

সানিয়া সিতারা

ত্রিপুরা রাজ্যের বিজয় স্মারক মুদ্রা ৩৯

জয়ন্ত সিংহ রায়

মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র ও বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা: একটি পর্যালোচনা ৫৯

জগন্নাথ বড়ুয়া

হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর অবদান: একটি বিশ্লেষণ ৮১

লুকনা ইয়াসমিন

বাংলায় আফগান শাসনামলে ভাষা ও সাহিত্যচর্চা (১৫৩৮-১৬১২ খ্রি.) ৯৯

সৈয়দ হাদিউজ্জামান

বাংলায় 'কলোনাইজেশন' আন্দোলন ও তৎকালীন সমাজ: তর্ক-বিতর্ক ১১৩

মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান হাওলাদার

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে বঙ্গীয় কিশোর সমাজ (১৯০৫-১৯৩২) ১৩৭

মৌসুমী দত্ত

পাবনায় স্বদেশী আন্দোলন, ১৯০৫-১৯১১ ১৫৫

মো. ছাবেদ আলী

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রামে ঢাকার অন্যতম বিপ্লবী গোষ্ঠী: শ্রীসংঘ ১৬৯

পলাশ মণ্ডল

পূর্ববাংলার মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পাট চাষের গুরুত্ব ১৯৩

এস.এম. রেজাউল করিম

পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চ শিক্ষা ১৯৪৭-১৯৭১: সরকারের ভূমিকা ২১১

মোছা. খোদেজা খাতুন

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রভাব: প্রেক্ষিত ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ২৩৯

সৈয়দা শায়লা তায়েফ

ষাটের দশকে বাম রাজনীতিতে মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব ও কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি ২৫৩

মোঃ আব্দুল কুদ্দুস সিকদার

Scanned by CamScanner

বিদেশি গণমাধ্যমের আলোকে ১৯৭০ সালের পূর্ব বাংলার 'ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস': একটি পর্যালোচনা ২৬৫
মোশারফ হোসেন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ ২৮১
মোহাম্মদ বশির আহাম্মদ

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে নারী শব্দ সৈনিকদের ভূমিকা ৩০৩
শান্তা পত্রনবীশ

বান্দুরার ভাঙ্গা শাহী মসজিদ: একটি প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ ৩১৯
মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস

বাংলাদেশে শিল্পকলার অব-ঔপনিবেশিকীকরণ ৩২৭
এ কে এম খাদেমুল হক

বাংলার সনাতন কৃষি-প্রযুক্তির ইতিহাস: প্রসঙ্গ ধানভানা ৩৩৯
মো. শাহিনুর রশীদ

স্থানীয় ইতিহাসের সাহিত্য-রূপ: প্রেক্ষিত সত্যেন সেনের পদচিহ্ন ৩৫৯
মোহাম্মদ হাননান

গোপালগঞ্জ জেলার খ্রিষ্টান সম্প্রদায় ৩৭৭
মো. আবুল বাশার

খুলনা জেলায় শিল্পের ক্রমবিকাশ, ১৯৪৭-১৯৭০: একটি পর্যালোচনা ৩৯৭
মোঃ কামরুজ্জামান

শেলবর্ষ পরগণার জমিদারি: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ৪৩১
সাহিদুর রহমান

লিঙ্গ বৈষম্যের পরিপ্রেক্ষিত ও বিবর্তনের রূপরেখা- ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ৪৩৯
অপর্ণা সাধু

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে চীনের দীর্ঘসূত্রতা: একটি তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ৪৫১
শারমিন জাহান চৌধুরী

চীনের সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিতে প্রবেশ প্রক্রিয়া (১৯৭৮-২০১২): একটি পর্যালোচনা ৪৭৯
মোহাম্মদ গোলাম সাকলায়েন সাকী
এ.এস.এম. মোহসীন

আফ্রিকায় 'গণতন্ত্রের' সংগ্রাম, ১৯৬০-১৯৯০ ৫২৭
প্রদীপ চাঁদ দুগার

Scanned by CamScanner

ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৩৭-৩৮, ১৪২২-১৪২৩/২০১৫-২০১৬, ৩৩৯-৩৫৮

বাংলার সনাতন কৃষি-প্রযুক্তির ইতিহাসঃ প্রসঙ্গ ধানভানা

মো. শাহিনুর রশীদ*

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার সমৃদ্ধ কৃষির কথা বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সে সময় কার্যকর ভূমি-কর্ষণ ব্যবস্থা কীরূপ ছিল; রোপণ ও বপনকৃত ফসলে সেচের প্রয়োজন ছিল কি না, থাকলে তার কী উপায় ছিল; ফসল ও বীজ সংগ্রহ-সংরক্ষণ প্রক্রিয়া কতটুকু কার্যকর ছিল; ধান হতে চাউল, গম হতে আটা, সরিষা হতে তেল তৈরিতে কী প্রযুক্তির আশ্রয় নেয়া হত, তার বিবরণ বা ব্যাখ্যা ইতিহাস গ্রন্থসমূহে উপস্থাপিত হয়নি। অথচ সামাজিক ইতিহাস চর্চায় 'সমাজের বৈষয়িক ভিত্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে জানতে হলে উৎপাদনের বাস্তব কৃৎকৌশলগুলির অধ্যয়নের তাত্ত্বিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও প্রযুক্তির ইতিহাস নিয়ে কাউকেই বিশেষ মনোযোগী হতে এ-পর্যন্ত দেখা যায়নি।'[১] এরূপ মন্তব্যের পর ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব নিজে এবং অন্যরা ভারতের প্রযুক্তির ইতিহাস চর্চায় মনোনিবেশ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও কৃষিসহ অন্যান্য প্রযুক্তির চর্চা বরাবরই গুরুত্ব পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যতিক্রম, প্রায় দুই দশক পূর্বে প্রযুক্তির ইতিহাস চর্চার যে সূত্রপাত হয়েছিল[২], তা আর অগ্রসর হয়নি। ইতিহাসের প্রচলিত উৎসসমূহে প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট তথ্যের অভাব[৩] এবং কৃষি-প্রযুক্তিসমূহ এতটাই জীবনঘনিষ্ঠ যে তা সকলের নিকট সাধারণ বলে বিবেচিত হওয়ায়, হয়ত কৃষি-প্রযুক্তির বিশেষত্ব ঐতিহাসিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। তবে আবহমান কাল থেকে বাংলার কৃষক-সমাজ কৃষির প্রতিটি ধাপে যে নানান ধরনের বৈচিত্রময় প্রযুক্তির ব্যবহার করে আসছে তার স্বরূপ নির্ণয় ও

* পিএইচ.ডি গবেষক ও সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, হযরত শাহ্ আলী মহিলা কলেজ, মিরপুর, ঢাকা

Scanned by CamScanner

প্রাচীনতা প্রমাণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এরূপ প্রেক্ষাপটে আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয় হিসাবে ধানভানার (Husking) প্রসঙ্গ নির্ধারিত হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি: ইতিহাসের প্রচলিত উৎসসমূহে প্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট প্রত্যক্ষ তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে গবেষণায় আরোহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।[৪] এজন্য প্রথমে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ধান চাষের বাস্তবতা, মধ্যযুগে বাংলার বাইরে চাউল রপ্তানির উদাহরণ, আধুনিককালে ধান হতে চাউল প্রস্তুতকরণে মটর চালিত যন্ত্র ব্যবহারের সূচনা এবং এর পূর্বে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। তারপর সনাতন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের নাম-শব্দ এবং তৎ-সংশ্লিষ্ট শব্দের ব্যুৎপত্তি বা প্রত্নতত্ত্বের (Etymology) প্রতি আলোকপাত[৫] করে এটা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে যে, সেসব সনাতন পদ্ধতি মধ্য ও প্রাচীনযুগে বা তারও পূর্বে বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

বাংলা অঞ্চলে ধান উৎপাদনের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। নব্যপ্রস্তর যুগে বাংলা অঞ্চলে কৃষির ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং বিহার, বাংলা ও উড়িষ্যার বেশ কিছু স্থানে নানা প্রজাতির ধান চাষের প্রমাণ রয়েছে।[৬] লৌহযুগেও বিভিন্ন প্রজাতির ধানসহ তৈলবীজ চাষের প্রমাণ পাওয়া গেছে।[৭] বগুড়ায় প্রাপ্ত আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর[৮] যে শিলালিপির (মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপি) সুত্র ধরে বাংলায় ঐতিহাসিক যুগের সূচনা ঘটে[৯] সে লিপিতেও ধান চাষের তথ্য রয়েছে।[১০] পশ্চিমবঙ্গের মহিষদল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৩৮০-৮৫৫ অব্দের পোড়া ধানের অঙ্গার আবিষ্কৃত হয়েছে।[১১] চন্দ্রকেতুরগড়-এ ফসল-কাটা উৎসবের চিত্র সম্বলিত খ্রিষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে (চিত্র ১)।[১২] লৌহের যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে মৌর্যযুগে বাংলায় ধানচাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটে।[১৩] আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর[১৪] রচনায় পতঞ্জলী ধানচাষের উল্লেখ করেছেন।[১৫] সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বিবরণে ধান[১৬] এবং একই সময়ের তাম্রপট্টোলীতে সরিষা উৎপাদনকারী[১৭] গ্রামের কথা জানা যায়। সেন যুগের লিপিতেও ধান ও ধান চাষের উল্লেখ রয়েছে।[১৮] মহাকবি কালিদাস (আনু. খ্রি.পূ. ১ম/ ৪র্থ শতক)[১৯], ঋষি পরাশর (আনুমানিক ৬ষ্ঠ থেকে একাদশ শতাব্দী)[২০] ও সন্ধাকর নন্দীও (আনু. ১০৮৪-১১৫৫ খ্রি.)[২১] ধান চাষের উল্লেখ করেছেন। এছাড়া খনার[২২] বচনেও বিভিন্ন কৃষি পণ্যের নাম, চাষ-পদ্ধতি ও সেচের তথ্য উল্লিখিত হয়েছে।[২৩] সাহিত্যিক সূত্রে মধ্যযুগে কৃষির নানা তথ্য পাওয়া যায়। বাংলা সম্পর্কে যেসব বিদেশী বা ঐতিহাসিকের

Scanned by CamScanner

বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে তাঁদের প্রায় সকল বিবরণে হয় বাংলায় ব্যাপক ধান চাষ নয়ত চাউল রপ্তানির খবর রয়েছে।[২৪] এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলা অঞ্চলের প্রধান ফসল ছিল ধান এবং বিশেষত মধ্যযুগে প্রচুর পরিমাণে চাল বাংলার বাইরে রপ্তানি হতো। ফলে ধান হতে চাউল প্রস্তুত করতে সে সময় অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি চালুর প্রয়োজন ছিল।

ধানভানা (Husking): সাধারণভাবে ধান থেকে তার বাইরের আবরণ, যা খোসা বা তুষ নামে পরিচিত তা পৃথক করার পদ্ধতিকে প্রমিত বাংলায় ধানভানা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ধানভানা অনেক সময় অনেক অঞ্চলে 'ধান কোটা', 'ধান কুটা', 'বারা ভানা' নামেও পরিচিত।[২৫] বর্তমানে বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদিত চাউল প্রধানত 'অটো রাইস মিল' এ এবং সাধারণ্যের চাউল প্রধানত ছোট বা *Small Engleberg huller*-এ উৎপন্ন হয়ে থাকে।[২৬] যন্ত্রটি প্রাথমিক অবস্থায় তৈল ইঞ্জিনে এবং বর্তমানে বৈদ্যুতিক মটরে চলে। যন্ত্রটি প্রথম পেটেন্ট হয় ইংলান্ডে, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে[২৭], এর পাঁচ বছর পর আমেরিকায় ধানভানার কল হিসাবে পেটেন্ট পায় (patent number 424602)।[২৮] এসব তথ্যের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে, বিশ শতকের শুরুতে ভারত উপ-মহাদেশে ধানভানতে ইঞ্জিন চালিত প্রযুক্তির ব্যবহার সূচিত হয়; এর পূর্বে ভারতে বা বাংলা অঞ্চলে কার্যত সনাতন পদ্ধতিতেই ধানভানার কাজ সম্পন্ন হত।

সনাতন পদ্ধতিতে ধানভানার ঐতিহ্য ও প্রযুক্তি

বাংলাদেশে ধানভানার সংস্কৃতি অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ট ও লাগসই-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ। ধানভানার সনাতন যন্ত্রসমূহের মধ্যে ঢেঁকি প্রধান। ঢেঁকির সহযোগী হিসাবে যেসব যন্ত্র বা হাতিয়ার কম বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হলঃ ছ্যাওয়া, জাঁতা ও শিল-পাটা।

১. ঢেঁকি: ঢেঁকি পা-চালিত ও লিভার (lever) ভিত্তিক একটি যৌগিক চাউল উৎপাদন যন্ত্র (চিত্র ৩)। এর প্রধান নির্মাণ উপাদান কাঠ। বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে ঢেঁকি নামেই পরিচিত। এটি প্রধানত পাঁচটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। এর দুইটি মূল অংশের সাথে সংযুক্ত এবং অপর দুটি স্বতন্ত্র। তবে উৎপাদনের সময় স্বতন্ত্র যন্ত্রাংশ সংযুক্ত যন্ত্রাংশের সাথে এক সাথে কাজ করে। মূল অংশটি কার্যত একটি গাছের কাণ্ড বা গুল; প্রায় ক্ষেত্রে গাছের কাণ্ডকে কেটে বা চেঁচে সাধারণত চার তল বিশিষ্ট এবং এর একদিক কিছুটা ছুঁচালো,

Scanned by CamScanner

অন্যপ্রান্ত সামান্য প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা রূপ দেয়া হয়। কার্যরত অবস্থায় এ অংশ লিভার দন্ড হিসাবে কাজ করে।

ছুঁচালো অংশটি এর সামনের দিক এবং এ প্রান্তের 'প্রায় এক ফুট'[২৯] অভ্যন্তরে ছিদ্র করে একটি গোলাকার কাঠের দণ্ড সংযুক্ত করা হয়। লোককলাবিদ ওয়াকিল আহমদ এ দণ্ডের শিষ্ট নাম দিয়েছেন *মুদ্গার* (চিত্র ৪)। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে এটি বগুড়ায় *মোনাই*, টাঙ্গাইলে *মুনুই*, চট্টগ্রামে *ওঁচা*, সিলেটে *মুকইর*, পাবনায় *চুরুম* নামে পরিচিত।[৩০] এর আরো আঞ্চলিক নাম রয়েছে যেমন *চুরুন* বা *চুরন* (নওগাঁ), *খাঁটে* (সাঁথিয়ায়, পাবনা), ভোলায় *মল*, যশোরে *ছ্যা* প্রভৃতি। এছাড়া *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*-এর মতে সিলেট-ময়মনসিংহ-ফরিদপুরে *মুগৈর্*, পাবনা ও ময়মনসিংহে *উ'চা*।[৩১] মদ্গারের অপর প্রান্তে 'লোহার পাতলা বলয়' সংযুক্ত হয়। এ বলয় ঢেঁকিতে ব্যবহৃত একমাত্র লৌহ উপাদান (চিত্র ৪)। জনাব আহমদ এর নাম দিয়েছেন *শামা* এবং শামার দুইটি আঞ্চলিক নাম– *মোহনা* (রাজশাহী) ও *গুইলা* (টাঙ্গাইল) বলে উল্লেখ করেছেন।[৩২] পাবনায় এটি *গুলে*, যশোরে *গুলো*, নওগাঁ ও ভোলায় *গুলা* নামে পরিচিত। ঢেঁকির শামা মূলত মুগুর হিসাবে কাজ করে।

ঢেঁকির অপর সংযুক্ত অংশটি লিভার দণ্ডের পশ্চাৎ দিকে যুক্ত। এটিও কাঠের একটি গোলাকার দণ্ড– যা সংযুক্ত হয়ে দুদিকেই বর্ধিত থাকে (চিত্র ৪)। এটি লিভার দণ্ডকে বিম হিসাবে ঠেস দিতে সাহায্য করে। ড. আহমদ এর সাধারণ নাম *কোমরশলাকা* এবং আঞ্চলিক নাম হিসাবে রংপুরে *আড়শলি*, টাঙ্গাইলে *আড় হলুই*, চট্টগ্রামে *আঁরাল*, ময়মনসিংহে *নাচনাকাঠি*, বগুড়ায় *সওকাবাড়ি* বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩] এছাড়াও এটি যশোরে *তসাইল*, ভোলায় *ন্যাচুনী*, পাবনায় *আশ্বলী*, নওগাঁয় *নাকশিলা* নামে অভিহিত হয়।

ঢেঁকির স্বতন্ত্র দুটি অংশের একটি হল *গড়* (চিত্র ৪ ক-অংশ)। এটি মদ্গার বরাবর মাটিতে স্থাপিত হয়। কাঠের গড় সাধারণত গাছের কর্তিত গুড়ি; যার মধ্যস্থলে পেয়ালাকৃতির একটি গর্ত থাকে। অনেক সময় গুড়ির পরিবর্তে গাছের কাণ্ডও ব্যবহৃত হয়। তবে মাটির গড়ের ব্যবহারও রয়েছে। এক্ষেত্রে গর্তের তলায় এক খণ্ড তক্তা, ইট বা পাথর বসানো হয়। গড়েরও আঞ্চলিক নাম রয়েছে। যেমনঃ যশোর, খুলনা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহে *লোট*, বরিশাল অঞ্চলে লোটা, সিলেটে *গাইল*, পাবনায় *পারন*। পাবনার সাঁথিয়ায় গর ও *পাড়ন* নামে পরিচিত এবং দিনাজপুর ও নওগাঁয় এটি গড় তবে এর গর্তটি ভিন্ন নামে– *অ্যনা /ওনা/ উনা* হিসাবে চিহ্নিত হয়।

ঢেঁকির অপর স্বতন্ত্র অংশ '*পোয়া বা পুয়া*'। এটি মূলত খাঁজ-কাটা দুটি কাঠের খুঁটি। প্রায় ক্ষেত্রে খুঁটি দুটি স্বতন্ত্র অবস্থায় মাটিতে গভীর করে গ্রথিত হয় (চিত্র ৪ খ-অংশ)। তবে যশোর - ভোলা অঞ্চলে গড়ের ন্যায় পৃথক গাছের গুড়ি কেটে খাঁজ যুক্ত দুটি খুঁটি তৈরি করে মাটিতে স্থাপিত হয় (চিত্র ৪ গ-অংশ)। উভয় ক্ষেত্রে খুঁটির খাঁজে ঢেঁকির কোমরশলাকা স্থাপিত হয়। পোয়া বা পুয়া বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমনঃ পাবনায় *কাতলা*, চট্টগ্রামে *কিলা*, খুলনায় *পই*, নওগাঁয় *কাতরা*।

ঢেঁকির মাধ্যমে ধান ভানার জন্য আরো প্রয়োজন কুলা ও জনবল। একটি ঢেঁকির কার্যক্ষমতা পূর্ণাকারে পরিচালিত করতে তিনজন মানুষের প্রয়োজন পড়ে। দুই জন ঢেঁকিতে ভার প্রয়োগ করে যা সামাজিক ভাষায় বলে ঢেঁকিতে পাড় দেয়া এবং একজন গড়ে ধান উল্টানো, ধান হতে বিযুক্ত ধানের খোসা-তুষ, *গুড়া* বা *কুড়া* ও চাউল উত্তোলন এবং পুনঃরায় গড়ে ধান সরবরাহ করে থাকেন– এসব কাজের আঞ্চলিক (নওগাঁ) নাম *আলেদেয়া*, আর যিনি *আলে* দেন তিনি *আলানী* নামে পরিচিত হন। তবে অনেক সময় আলানীর অনুপস্থিতিতে তার আংশিক কাজ করে বক্রমুখ বিশিষ্ট লগি *আঁকশি*। সেক্ষেত্রে একজন পাড়ানী পাড়রত অবস্থায় পাড়জনিত যে ধান গড় থেকে উপরে উঠে আসে তা *আঁকশির* সাহায্যে পুনঃরায় গড়ে ঢেলে দেয়।

২. উদূখলঃ উদূখল ধানভানার আর একটি ঐতিহ্যবাহী সরল যন্ত্র (চিত্র ৫)। পার্বত্য এলাকায় এবং রংপুর অঞ্চলে এখনও এর ব্যবহার রয়েছে। এটি কাঠ দিয়ে তৈরি ও ডুগডুগি আকৃতির। এটি আরো যে নামে পরিচিত তারমধ্যে *ছ্যাওয়া*, *ওখলি*, *উকলি*, *উখলি* প্রভৃতি অন্যতম। এর দুটি অংশ; প্রধান অংশটি মূলত ছাওয়া বা উকলি নামে পরিচিত এবং অপর অংশটি *মুষল* নামে পরিচিত। মূল অংশটি কার্যত একটি কাঠের গুল, যা বাইর দিক থেকে দেখতে ডমরুর মত এবং যার উপর দিক ঢেঁকির গড়ের ন্যায় গর্তযুক্ত, তবে গর্ত আকারে অধিক পরিসর বিশিষ্ট। আর মুষল মূলত ঢেঁকির মদ্দার-এর ন্যায় তবে এটির দৈর্ঘ্য বেশি এবং যা তিন বা সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ হয়ে থাকে। মুষলের এক প্রান্তে মদ্দারের মত শামা সংযুক্ত থাকে। একজন বা দুইজন দাঁড়িয়ে দুটি মুষল চালনা করে ধানভানার কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

৩. জাঁতাঃ জাঁতাকে প্রধানত শস্যদানা ভেঙে, অথবা গুঁড়া করে ডাল, আটা, ছাতু প্রভৃতি তৈরির একটি যন্ত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।[৩৪] জাঁতা মূলত দুইটি

Scanned by CamScanner

গোলাকার পাথরের চাক্তি (চিত্র ৬)। দুটি চাক্তির মধ্যভাগে একটি করে এবং এদের একটিতে আরো একটি বেশি ও প্রান্তভাগে প্রশস্ত ছিদ্র থাকে। চাক্তি দুটিকে কার্যকর করতে দুই ছিদ্রবিশিষ্ট চাক্তিকে অপরটির উপর স্থাপন করা হয় এবং মাঝের ছিদ্রে একটি বাঁশ বা কাঠের খুঁটি বা গোজ বা গুজ প্রবেশ করিয়ে মাটিতে আটকিয়ে রাখা হয়। উপরের চাক্তির প্রান্তভাগের প্রশস্ত ছিদ্রের বিপরীত প্রান্তে আরো একটি অগভীর গর্ত থাকে– এ গর্তে একটি লাঠির প্রান্তভাগ বসিয়ে চাক্তিকে ঘুরানো হয়। প্রশস্ত ছিদ্রের মাধ্যমে শস্যদানা দুই চাকতির মধ্যে প্রবেশ করে। অনেক সময় উপরের চাকতিতে শুধুমাত্র মাঝে একটি ছিদ্র থাকে, এ ক্ষেত্রে ছিদ্রটি অপেক্ষাকৃত অধিক প্রশস্ত হয় এবং উপরের চাকতির মাঝ বরাবর একটি হাতল সংযুক্ত থাকে এবং প্রশস্ত ছিদ্র দিয়ে শস্যদানা প্রবেশ করে। হাতল বা পূর্বোক্ত লাঠির মাধ্যমে উপরের চাকতি ঘুরিয়ে দুই চাকতির মধ্যস্থ শস্যদানার খোসা ছাড়ানো হয়।

৪. শিল-নোড়াঃ শিল মূলত আয়তাকার পুরু এবং সমতল বিশিষ্ট পাথরের খণ্ড। তবে প্রায় ক্ষেত্রে আয়তাকার খণ্ডটির সম্মুখ অংশ খিলানাকার। আর নোড়া হল প্রায় বেলনাকার এবং শিলের প্রশস্তের সমান দৈর্ঘ্যের একটি পাথর খণ্ড (চিত্র ৭)। শিলের উপর মরিচ, হলুদ, মসলা প্রভৃতি রেখে নোড়া সামনে পিছনে চালনা করে বাঁটা বা পেষণ করা হয়। বর্তমানে শিল-নোড়ার এ ব্যবহারের বিপরীতে মনে হয় প্রথম দিকে শস্য দানা পেষণে বা শস্যের খোসা ছড়ানোর কাজেও ব্যবহৃত হতো।

বাংলা সাহিত্যে ধানভানা সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু প্রবাদ রয়েছে। যেমনঃ "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে", "ধান ভানতে শিবের গীত", "বুকে ঢেঁকির পাড় পড়া (মনে নিদারুন আঘাত পাওয়া)", "তুষের আগুন", "বুদ্ধির ঢেঁকি (নিরেট বোকা)", "যার ঘরে নাই ঢেঁকি মোষল/ সেই বউ-ঝির নেইকো কুশল"[৩৫]। প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটি গীত উল্লেখ করা যেতে পারে। এক. অ্যালকাষ্টের ঢেঁকি রে মোর, ব্যালকাষ্টের উনা,/ কয়ে পাটাও মোলে-র কাচে, কে কে বান্‌বে ধান রে, মোর সতীন বড়ই ঝোনা॥/ আইতন বান্‌বে ধান রে মোর, ছাইতন দিবে পাড়,/ কাল আচে চিনিকাবাসী, তাঁই তুলবে চাউল রে, মোর সতীন বড়ই জোনা॥[৩৬]। দুই. ও ধান ভানি রে/ ঢেঁকিতে পাড় দিয়া/ ঢেঁকি নাচে আমি নাচি/ হেলিয়া দুলিয়া ও ধান ভানি রে/ ধান বেচিয়া কিনমু শাড়ি/ পিন্দা যামু বাপের বাড়ি ও/ খালে বিলে আইলে পানি/ নায়ে ছইয়া দিয়া/ চক বাজারের চিকন চুড়ি/ আইনা দিমু হাতে/

Scanned by CamScanner

মগবাজারের মিহিন মেশি/ দিমু চিরল দাঁতে/ বাড়ি আইলে ইষ্টি কুটুম/ আইনা ধানের গুড়ি কুটুম রে/ পিঠা পায়েশ খাইমু মোরা/ পাড়া পড়শি লইয়া।[৩৭]

ধানভানা যন্ত্রসমূহের ঐতিহাসিকতা: ধানভানার যন্ত্রসমূহের ঐতিহাসিকতা প্রমাণের সম্ভবত প্রত্যক্ষ কোন প্রমাণ নাই। বিশেষত মধ্য ও প্রাচীনযুগ বা আরো পূর্বের কোন প্রত্যক্ষ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি; পশ্চিমবঙ্গের আঠারো শতকের একটি মন্দির গাত্রের টেরাকোটায় ঢেঁকিতে ধানভানার চিত্র ব্যতিত কোন ভৌত-প্রত্ন নিদর্শনও আবিষ্কৃত না হওয়ায় এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিক উৎস বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে। এর সাথে ধানভানার কার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহের (যন্ত্রাংশসহ) নামবাচক এবং তৎসংশ্লিষ্ট শব্দের প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগৃহীত হতে পারে।

বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান মতে ঢেঁকি শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে ষোল শতকের কবি 'কবিকঙ্কন' মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর (আনু. ১৫৪০-১৬০০) রচনায়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঢেঁকি ছাড়াও *ঢেঁকিশাল* ও *ঢেঁকিশালা* শব্দও ব্যবহার করেছেন। তবে মনে হয় মুকুন্দুরামের পূর্বেও ঢেঁকি শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।[৩৮] যেমন, রামাই পণ্ডিত *শুণ্যপুরানে* ঢেঁকি শব্দের ব্যবহার করেছেন। *শুন্যপুরানের* একটি অধ্যায়ের (২৮ নম্বর) নাম "অথ ঢেঁকী-মঙ্গলা"।[৩৯] রামাই পণ্ডিতের কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে; পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে তিনি নবম থেকে ষোল শতকের মধ্যে যে কোন সময়ের মানুষ।[৪০] তবে ওয়াকিল আহমদের মতে তিনি মুসলিম বিজয়োত্তর তেরো শতকে বর্তমান ছিলেন।[৪১] এছাড়া আঠারো শতকের কবি রামেশ্বর তাঁর *শিবসংকীর্তনে* লিখেন "নারদের ঢেঁকি লয়ে ধান ভানে ভূতে"।[৪২] তাঁর রচনায় ঢেঁকির *পুয়া* 'র উল্লেখ লক্ষণীয় (পুয়া হৈল পুরাতন আঁকসলি নড়ে)।[৪৩] সমসাময়িক কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকার লিখেন "কন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী, আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি"। নারদ পৌরাণিক চরিত্র, ব্রহ্মার মানস পুত্র।[৪৪] নারদের বাহন হিসাবে চিহ্নিত ঢেঁকিও প্রাচীনতার দাবিদার। ঢেঁকির অংশ মুষল কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনায় ষোল শতকে ব্যবহৃত হয়েছে।[৪৫] ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে উমেশচন্দ্র মিত্র ঢেঁকি, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্যারী মোহন ঢেঁস্কেল (ঢেঁকিশাল), বিদ্যাপতি ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে ঢেঁকিশাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ঢেঁকিঘর নিজ নিজ রচনায় ব্যবহার করেছেন। এসব সাহিত্যিক সূত্র এটা নিশ্চিত করে মধ্যযুগে ঢেঁকির মাধ্যমে ধানভানার কাজ সম্পন্ন হত এবং বিশ শতকে ইঞ্জিন চালিত যন্ত্রের ব্যবহার সূচিত হলেও ঢেঁকির ব্যাপক ব্যবহার

Scanned by CamScanner

প্রচলিত ছিল অন্তত পঞ্চাশ বছর। এসব প্রত্যক্ষ সূত্র ব্যতীত কিছু সূত্রে ধানভানার সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য রয়েছে। সেসব তথ্যও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। যেমন: শ্রীধর দাস কর্তৃক ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে সংকলিত *'সদ্যুক্তিকর্ণামৃত'* গ্রন্থে একটি শ্লোকে বলা হয়েছে– গান গেয়ে গ্রাম্য রমণীরা চাউল কাড়ছে, তাদের গানের সুরের সাথে হাতে আন্দোলিত চুড়ির ধ্বনি মিলিত হচ্ছে।[৪৬] এ যে ঢেঁকিতে ধানভানার সাথে গীতের কথা বলা হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নাই। এরূপ একটি অনন্য চিত্র ফুটে উঠেছে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত দামোদর নবরত্ন মন্দিরের (কল্যানপুর, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) টেরাকোটা অলঙ্করণে। সে টেরাকোটায় দুই জন মহিলা ঢেঁকিতে *পাড়* দিতে এবং একজন মহিলাকে *আলে* দিতে দেখা যাচ্ছে (চিত্র ৮)।[৪৭] Colonel James Skinner (1778–1841) *Tashrih-al Aqwam* গ্রন্থে বলেছেন যে 'ধানুক'গণ ধান পরিবহন করার সাথে সাথে ধানভানার সাথেও জড়িত ছিল।[৪৮] পুর্বোল্লিখিত প্রবাদও এসব যুক্তিকে সমর্থন করে। প্রবাদ সম্পর্কে লোক-কলাবিদ ওয়াকিল আহমদ বলেছেন– প্রবাদ সমকালকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করে রয়েছে। প্রবাদ পাথরের নুড়ির মতো; সমাজমানসে জন্ম নিয়ে জীবনস্রোতের অনেক পথ পরিক্রমা করে একটি নিটোল রূপ লাভ করে। এর পরে তা আর ভাঙে না বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।[৪৯] তেমনই একটি প্রবাদ *ধানভানতে শিবের গীত* বা *ধানভানতে মহীপালের গীত*। এখানে শিব কৃষিদেবতা এবং মহীপাল পাল বংশের একজন শক্তিশালী শাসক।[৫০]

ঢেঁকির মত ধানভানার সনাতন প্রযুক্তির যন্ত্র জাঁতাও যে মধ্যযুগে শস্যদানার খোসা ছাড়াতে ব্যবহৃত হয়েছে তার প্রমাণ সাহিত্যিক সূত্র। সম্ভবত শুণ্যপুরানে জাঁতা শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে ("হনুমান টানে জাঁতা হুতার লহরি")। ষোল শতকের কবি 'কবিকঙ্কন' মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর রচনাতেও জাঁতার উল্লেখ পাওয়া যায় (জাঁতিয়া গাঁথিয়া সোনা/ সাঁড়াশীতে টানে গুণা)। একই কাজে মধ্যযুগে *উদূখল* বা *উখলি* ব্যবহারের দৃষ্টান্ত রয়েছে সাহিত্যিক উৎসসমূহে। ১৫ ও ১৬ শতকের সন্ধিক্ষণের কবি মালাধর বসু *উদূখল*, ১৬ শতকের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী *উদূখল*, ১৮শতকের প্রথম ভাগে মানোএল দা আসসুম্পাসাঁও *উখলি* শব্দ বর্তমান অর্থেই নিজ নিজ রচনায় ব্যবহার করেছেন।[৫১]

মধ্যযুগে ব্যবহৃত ধানভানর উপর্যুক্ত প্রযুক্তিসমূহ কতটা প্রাচীন তা প্রমাণের প্রত্যক্ষ কোন তথ্য আবিষ্কৃত হয়নি। তবে দিনাজপুর জেলার হাকিমপুরে

Scanned by CamScanner

(হিলি) প্রাপ্ত খ্রিস্টীয় ৪৪৭-৪৪৮ সালের প্রথম কুমারগুপ্তের বৈগ্রাম পট্টোলীতে উল্লিখিত হয়েছে জমির সীমানা নির্ধারণে তুষের ছাই ব্যবহার করা হতো।[৫২] এ থেকে অনুমান করা যায় প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা অঞ্চলে ধান থেকে তুষ পৃথক করার ব্যবস্থা ছিল। তার প্রমাণ ধানভানা সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ শব্দের বুৎপত্তিগত পুরাতাত্ত্বিক তথ্য। যেমনঃ ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় বা অভিধানে ঢেঁকি বা ঢেঁকী শব্দটিকে মুণ্ডারি বা মুণ্ডারি অষ্ট্রিক শব্দ *ঢেক্কি* জাত বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৫৩] শব্দটি হিন্দি ভাষায় *ঢেংকী*[৫৪], নেপালি ভাষায় *ঢিকি*, রাজবংশী ভাষায় *ঢেকি*, সাদ্‌রি ভাষায় *ঢেকি*, বোড়ো ভাষায় *ডিখি*, রাভা ভাষায় *ডিংকি*, গারো ভাষায় *ঢেংকি*, টোটো ভাষায় *ঢেকি*, ধিমল্ ভাষায় *ঢেঁকি*, কুড়ুক ভাষায় *ঢিংকি* হিসাবে গৃহীত হয়েছে।[৫৫] এর মধ্যে বোড়ো, রাভা, গারো, টোটো, ধিমল ভোট-ব্রহ্ম ভাষা পরিবার ভুক্ত এবং কুড়ুক দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।[৫৬]

ধানভানলে যে দানা পাওয়া যায়, অর্থাৎ সে চাউল শব্দটি মুণ্ডারি শব্দ *চাওলে* থেকে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে।[৫৭] ধানভানা প্রায় ক্ষেত্রে *কাঁড়া* ও *কুটা* বা *কোটা* হিসাবে চিহ্নিত হয়। এর মধ্যে *কাঁড়া* ও *কুটা* বা *কোটা* দ্রাবিড় উৎস থেকে আগত।[৫৮] চাউল কাঁড়ার সময় *আলেনি আলেদেয়ার* কাজ করে। এ শব্দদ্বয়ের *আলে* সাঁওতালি শব্দ *উলাও* থেকে উদ্ভূত এবং একই অর্থে ব্যবহৃত।[৫৯] ধান কাঁড়ার প্রথম স্তর রাজশাহী, দিনাজপুরে *বাঁকড়* নামে পরিচিত। এ *বাঁকড়*-এর সাথে দ্রাবিড় শব্দ *আকড়া*-এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকতে পারে। কারণ *আকড়ার* অর্থ শস্য বিহীন ধান বা তুষ। এ তুষ বা ধানের খোসা যা অনেক সময় *ভূষি* এবং ফরিদপুরে কোন শস্যের খোসা বা চামড়া *সলা* হিসাবে চিহ্নিত হয়। এর মধ্যে ভূষি সাঁওতালি শব্দ *ভুসৗ* থেকে আগত আর *সলা* অবিকৃত সাঁওতালি শব্দ।[৬০]

ধানভানার সময় চাউল ও তুষ পৃথক করার জন্য ব্যবহৃত হয় কুলা। কুলা শব্দটি অভিধানে সংস্কৃত শব্দ কুল্য থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছে বলে উল্লিখিত হয়েছে। তবে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীতেও কুলা একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুলা দিয়ে ধান বা চাউল ঝাড়া- এ ঝাড়া অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীতে একই ভাব প্রকাশ করে থাকে। এ ছাড়া তুষ পৃথককৃত চাউল রাখা হয় যে আধারে, যেমন ঝুড়ি, টুকরি, ডালা–এ তিনটি শব্দও অষ্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর সাঁওতালি শব্দ।

Scanned by CamScanner

ধানভানার সাথে ঢেঁকি বা উখলির যে যন্ত্রাংশ সরাসরি ভূমিকা পালন করে থাকে তা হল ঢেঁকির *মুদ্গার* আর উখলির *মুষল*। অভিধানে *মুদ্গার* অর্থ মুগুর বা গদা। শব্দটি সংস্কৃত মুদ্+গর সহযোগে গঠিত। আবার গদা একই অর্থে দ্রাবিড় *গদা*। শব্দটি সংস্কৃত মুদ্+গর সহযোগে গঠিত। আবার গদা একই অর্থে দ্রাবিড় শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত।[৬১] এর আঞ্চলিক শব্দ *চুরুম, চুরুন* বা *চুরন* শব্দগুলো <চূর্ণ জাত। অপর দিকে মুষল শব্দটি দ্রাবিড় শব্দজাত। *মুদ্গার* বা মুষলের মাথায় লোহার বলয়– *শামা* বা *সামা* সাঁওতালি শব্দ *সাম্ভে* থেকে উদ্ভূত। এর আঞ্চলিক শব্দ *ছ্যা* বা *ছ্যাওয়া* শব্দসমূহও হয়ত *সাম্ভে* থেকে উদ্ভূত। ঢেঁকির গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ গড়। *গড়* শব্দটি সাঁওতালি অর্থাৎ কোল-মুণ্ডা, যা অবিকৃত অবস্থায় বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে।[৬২] গোলাকার গভীর পরিখা বেষ্টিত ক্ষুদ্র দূর্গ অর্থে 'গড়'কে দেশি শব্দ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন Krishnapada Goswami *Place name of Bengal* গ্রন্থে।[৬৩] বাংলা ভাষার 'গাড়া'র অর্থ গর্ত, খানা বা ডোবা, বরেন্দ্র অঞ্চলের আঞ্চলিক শব্দ 'গড়া' অর্থ বাঁশের বাতার তৈরি গরু-মহিষের খড় বা বিচালি জাতীয় খাদ্যাধার। ক্ষুদ্র দূর্গ অর্থে 'গড়', ডোবা অর্থে 'গাড়া' এবং বিচালিজাতীয় খ্যাদ্যধার অর্থে 'গড়া'র মধ্যে সাদৃশ্য হলো, সবগুলোই আকারে গোলাকার। ঢেঁকির গড়ও আকৃতিতে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্যপূর্ণ। একই অর্থে গারা বা গাড়া, গড় দ্রাবিড় শব্দজাত।[৬৪] শব্দসমূহের মধ্যে গড় এর আঞ্চলিক শব্দ *পারন, পারোন বা পাড়ন*কে বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধানে সংস্কৃত শব্দ *পাত্* শব্দজাত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে শব্দটি সাঁওতালি থেকে বাংলায় স্থান করে নিয়েছে।[৬৫] Thomas Burrow and M. B. Emeneau প্রণীত *A Dravidian Etymological Dictionary* সূত্রে জানা যায় *উদূখল* শব্দটি নিজেই দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ।[৬৬] তবে বাংলা অভিধানে উৎ+উখ্+ল বিবেচনায় *উদূখল* শব্দকে সংস্কৃত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবার সাঁওতালি ভাষার শব্দ উখুড়-এর অর্থ কাঠের তৈরি পাত্র যাতে ধান পিষে চাল বের করা হয়।[৬৭]

ঢেঁকির *কোমরশলাকার* আঞ্চলিক শব্দ *আড়শলি, আড় হলুই, আঁরাল* শব্দসমূহের *আড়* সাঁওতালি শব্দ *আঁড়িস* ও *আঁড়ি'চ* থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ বিরুদ্ধতা। বাংলা শব্দ আড়া-আড়ি শব্দের উৎপত্তি সম্ভবত সে শব্দ থেকে।[৬৮] উল্লেখ্য যে *কোমরশলাকা* ঢেঁকিতে আড়া-আড়ি করে সংযুক্ত হয়। আর *আঁকশলা, আঁকশলী* বা *আশ্বলী* সংস্কৃত শব্দ *অক্ষশলাকা* থেকে উদ্ভূত। এভাবে ঢেঁকির পা সাদৃশ্য *পোয়া, পুয়া* বা *পই* পা বা পদ থেকে উদ্ভূত এবং এর মূল শব্দ পাদ, যা সংস্কৃত।

Scanned by CamScanner

পোয়ার আঞ্চলিক শব্দ *কাতলা*, ও *কাতরা* সংস্কৃত শব্দ কাষ্ঠ থেকে এসেছে। কাঠের ঘর মনে হয় কাঠগড়া প্রভৃতি হয়ে কাতরা হয়েছে।

অভিধানে শিল-পাটা শব্দ দুটির উৎস হিসাবে সংস্কৃতকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে অনেকে শিল শব্দকে আর্যপূর্ব শব্দ হিসাবে অভিমত দিয়েছেন।[৬৯]

এছাড়া জাঁতার সাথে সংশ্লিষ্ট ডাল, মটর, কলাই, ছোলা, খোসা, গুজা বা গুজি প্রভৃতি শব্দসমূহ হয় অস্ট্রিক নয়ত দ্রাবিড় উৎসজাত। তাছাড়া বাঁশ, চালনি, হুড়ুম, ছাতু, ছেঁচা প্রভৃতি শব্দও একই উৎস হতে আগত।

ধানভানার সাথে সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহের ভাষাতাত্ত্বিক এ ব্যাখ্যা শব্দসমূহের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। এটা সর্বজন স্বীকৃত যে জ্ঞাত তথ্যমতে বাংলা অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রা ছিলেন প্রধান।[৭০] আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের[৭১] দিকে উত্তর ভারতে আগমনের অনেক পরে আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করে। গুপ্তযুগের পূর্বে[৭২] বাংলা অঞ্চলে আর্যদের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত অস্ট্রিক-দ্রাবিড়রাই ছিলেন প্রধান জনগোষ্ঠী।[৭৩] এদের ভাষা যথাক্রমে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষা নামে পরিচিত। অস্ট্রিক ভাষার বর্তমান প্রতিভূ হচ্ছে মুণ্ডারি ভাষা– যে ভাষা সাঁওতাল, মুণ্ডা, কোরওয়া, কোরবু প্রভৃতি জাতিসমূহ ব্যবহার করে থাকে।[৭৪] অপর দিকে দ্রাবিড় ভাষার উত্তরসূরী হলো-গোণ্ড, মালের, কুই (খন্দ), ওরাওঁ (কুড়ুখ) ভাষা।[৭৫] এ ছাড়া এ অঞ্চলের অপর প্রাচীন ভাষা হল ভোট-চিনীয় বা ভোট-ব্রহ্ম; এ ভাষার বর্তমান প্রতিনিধি মেচ, বরা, রাভা, টিপুরা, বোডো প্রভৃতি ভাষা।[৭৬] আর যেহেতু ধানভানার সনাতন সংস্কৃতির প্রায় সকাল শব্দ আর্যপূর্ব ভাষাগোষ্ঠী হতে আগত, তাই বলা যেতে পারে ধানভানার ঢেঁকি-জাঁতা-উখলি সংস্কৃতির সাথে আর্যপূর্ব জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্ক রয়েছে। সে সম্পর্কের সূত্র ধরে এ অনুমান অমূলক নয় মধ্যযুগের ন্যায় প্রাচীন যুগে এবং তারও পূর্বে বাংলা অঞ্চলের মানুষ ধান হতে চাউল প্রস্তুত করতে কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার জানত। আর সে কার্যকর প্রযুক্তির যন্ত্র যে ঢেঁকি-জাঁতা-উখলি তাতে কোন সন্দেহ নাই উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় নব্যপ্রস্তর যুগে বাংলা অঞ্চলে ধান চাষের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তা প্রাচীন ও মধ্যযুগে মানুষের প্রধান ফসলে পরিণত হয়। উৎপাদিত সে ধান হতে তৈরিকৃত চাউল মধ্যযুগে রপ্তানিও হয়েছে। ফলে ধান হতে চাউল প্রস্তুত করতে সেসময় অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি চালুর প্রয়োজন ছিল। আদি মধ্যযুগের লিখিত সাহিত্যিক সূত্র প্রমাণ করে, মধ্যযুগে মানুষ

Scanned by CamScanner

ধানভানার জন্য দেশীয় সনাতন প্রযুক্তির আশ্রয় নিত। অন্যদিকে শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও শব্দের প্রাচীনত্ব এবং প্রবাদ-প্রবচন ও গীতিতে ধানভানার যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে এ সিদ্ধান্ত অমূলক নয় যে, প্রাচীনযুগ এবং আরো আগে থেকেই বাংলার মানুষ প্রধানত ঢেঁকি, উদূখল ও জাঁতা ব্যবহার করে ধানভানার কাজ সম্পন্ন করত। সমকালীন বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে এ প্রযুক্তি সাযুজ্য পূর্ণও বটে। সম্ভবত বাংলার প্রায় সকল পরিবার প্রয়োজনীয় চাউল নিজেই তৈরি করত। ধানভানার দেশীয় যন্ত্র ও যন্ত্রসমূহের আঞ্চলিক নামের আধিক্য এবং কর্মকাণ্ড কেন্দ্রিক প্রবাদ ও গীতি যে জীবনঘনিষ্ঠ সংস্কৃতি প্রকাশ করে তা মূলত তাই প্রমাণ করে। এ স্বনির্ভরতা নতুন কিছু নয়; গ্রামীণ সংস্কৃতির সাধারণ অথচ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।[৭৭] এ সংস্কৃতিতে নতুন উপাদান যুক্ত হয় জ্বালানি নির্ভর ইঞ্জিন চালিত যন্ত্রের প্রচলনের মধ্য দিয়ে। যা বাংলায় বিশ শতকের পূর্বে শুরু হয়নি। উৎপাদনের গতি ব্যতীত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় ধানভানার দেশীয় পদ্ধতিসমূহের প্রযুক্তিও অত্যন্ত কার্যকর বলে বিবেচিত হয়। এসব যন্ত্রের নির্মাণ উপাদান স্থানীয়, প্রযুক্তি স্ব-উদ্ভাবিত, সম্পূর্ণরূপে পরিবেশ বান্ধব এবং উৎপাদিত চাউল অধিক স্বাস্থ্যকর; যা টেকসই কৃষির পরিপূরক।

চিত্রাবলী

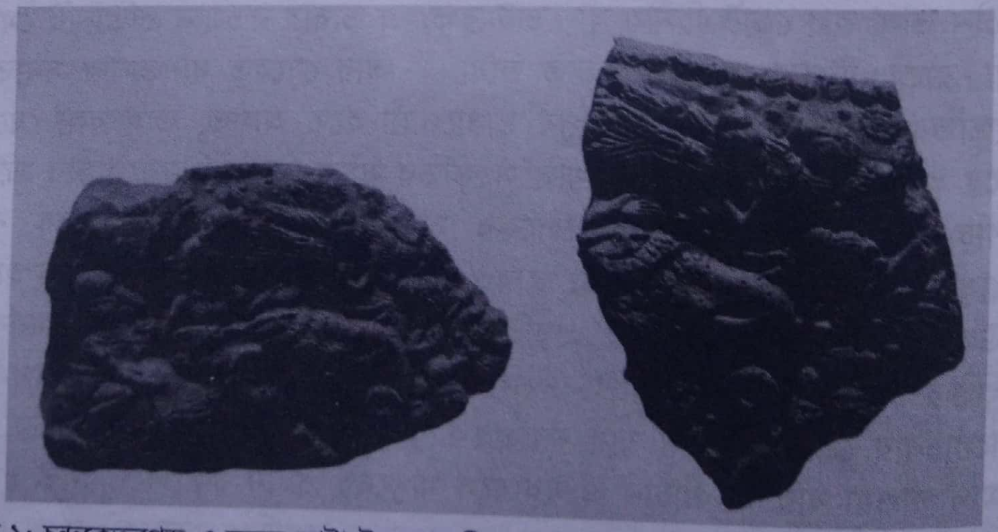

চিত্র ১: চন্দ্রকেতুরগড়-এ ফসল-কাটা উৎসবের চিত্র সম্বলিত খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দীর পোড়ামাটির ফলক।

সূত্র: Enamul Haque, *Chandraketugarh: A Treasure-house of Bengal Terracottas*, Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art, 2001, Plate C868 & C872, p. 337.

Scanned by CamScanner

চিত্র ২: Dun's Review তে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

সূত্র: http://babel.hathitrust.org/cgi/ pt?id =uc1. c2554754;view=1up;seq=62, 09.09, AM, 13 May, 2015.

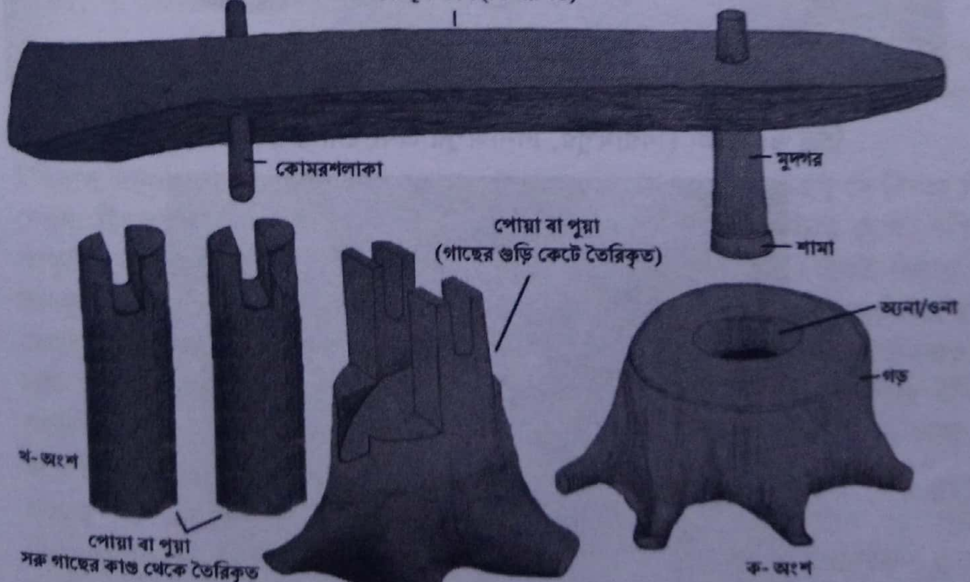

চিত্র ৪: ঢেঁকির বিভিন্ন অংশ

Scanned by CamScanner

চিত্র ৫: উদূখল (গোলাপগঞ্জ, সিলেট), ছবি- এম. মোকছেদ আলী

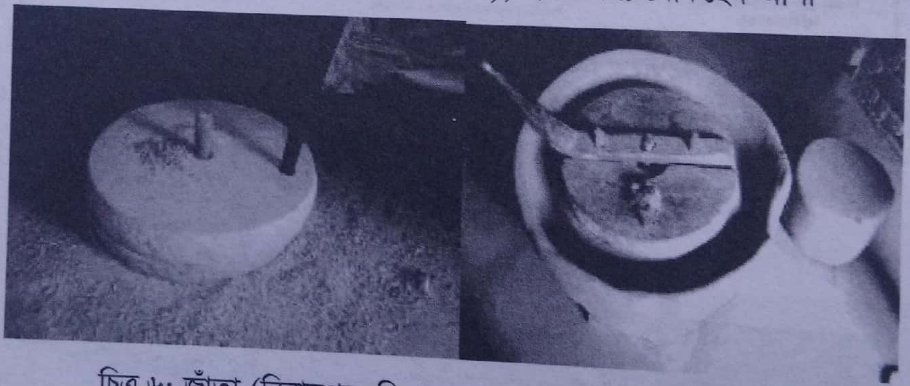

চিত্র ৬: জাঁতা (বিরামপুর, দিনাজপুর এবং গোদাগাড়ী, রাজশাহী)

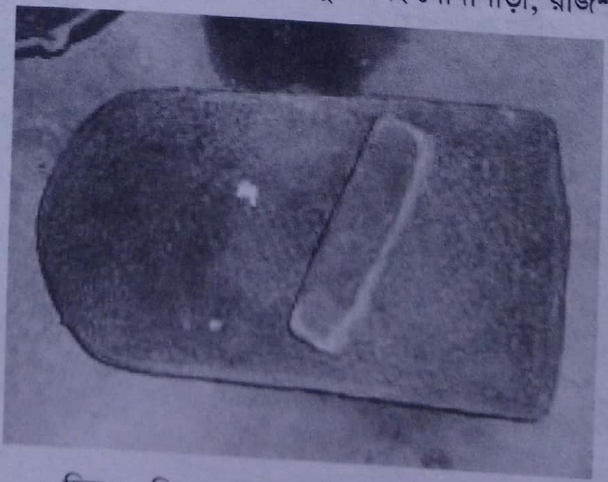

চিত্র ৭: শিল-নোড়া (বিরামপুর, দিনাজপুর)

চিত্র ৮: পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার কল্যানপুরে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত দামোদর নবরত্ন মন্দিরের টেরাকোটায় দুই জন মহিলাকে ঢেঁকিতে পাড় দিতে এবং আলে দিতে দেখা যাচ্ছে।

সূত্র: Zulekha Hakue, *Terracotta Decorations of Late Mediaval Bengal Portayal of a Society*, Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1980, প্লেট-৬৯।

তথ্যসূত্র:

১। ইরফান হাবিব, "ইতিহাস-গবেষণায় প্রযুক্তি-চর্চার গুরুত্ব", *মধ্যকালীন ভারত* (ইরফান হাবিব সম্পাদিত), কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৭, পৃ. ১৪

২। যেমন- মমতাজুর রহমান তরফদার, *মধ্যযুগের বাংলায় প্রযুক্তি ও সমাজ বিবর্তন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩; মুহম্মদ জাকারিয়া খান, "ঢাকাই মসলিনের বয়নশিল্প ঃ ইতিহাস ও প্রযুক্তি", *ইতিহাস*, সপ্তবিংশতি বর্ষ, বৈশাখ- চৈত্র ১৪০০, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯৫, পৃ. ৩৩-৫৫

৩। এ অভাব মূলত ইতিহাস উপকরণের রক্ষণশীল সংজ্ঞায়ন সৃষ্ট। বিস্তারিত দেখুন: যতীন সরকার, "ইতিহাস-গুরু রবীন্দ্রনাথ", *ইতিহাস*, ত্রয়োদশ বর্ষ, বৈশাখ- চৈত্র ১৩৮৬, ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৮১, পৃ. ২৬-৩৮

৪। ইতিহাস অনুসন্ধানে এ পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত না হলেও এ যে অত্যন্ত ফলপ্রসূ সে বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন: নীহাররঞ্জন রায় "ইতিহাস রচনার সাম্প্রতিক একটি পদ্ধতি", বিনয় ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, কলিকাতা: পুস্তক প্রকাশক, জানুয়ারি ১৯৫০, পৃ. ৭৭৯-৭৮৪। একই বিষয়ে প্রফেসর আবদুল মমিন চৌধুরী ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের *বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্বে*র অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাসের এ দৃষ্টিভঙ্গির ফলপ্রসু প্রয়োগ লক্ষ করেছেন। প্রফেসর চৌধুরী নিজেও বর্তমান হতে অতীতের দিকে ধাবিত হওয়ার রীতি প্রয়োগ করেছেন তাঁর *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি* গ্রন্থে। সূত্র: আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, মার্চ ২০১২, পৃ. ৮৮, ৮৯ ও ৯৮

৫। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎসের অবর্তমানে ইতিহাসে শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ও পুরাতাত্ত্বিক (Etymology) তথ্য বা ব্যাখ্যার ব্যবহার বিরল নয়; ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় প্রাচীন বাংলার গণনারীতি (পৃ. ৪৩), লাঙলের প্রাচীনত্ব (পৃ. ৪৮), বিভিন্ন ফসল ও তরিতরকারির নাম (পৃ. ৪৯, ৪৪৭), স্থান-নাম (পৃ. ৫১), বাঙালীর প্রধান খাদ্য (পৃ. ৪৪৩) প্রভৃতির বর্ণনা দিয়েছেন 'প্রাচীনতম ঐতিহাসিক' ও 'নির্ভরযোগ্য' উপাদান অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর শব্দের ভিত্তিতে

Scanned by CamScanner

(সূত্রঃ নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব*, কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ)। অধ্যাপক এ কে এম শাহনাওয়াজ অস্ট্রিক আর দ্রাবিড় শব্দের পারিভাষিক অর্থ থেকে সে সময়ের মানুষের পোশাক, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতির ইঙ্গিত পেয়েছেন (সূত্রঃ এ কে এম শাহনাওয়াজ, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতক ঐতিহ্য*, ঢাকাঃ নভেল পাবলিশিং হাউস, ২০১০, পৃ. ১১১)। এ প্রসঙ্গে শব্দের ব্যুৎপত্তির অধ্যয়ন (Etymology)-এর প্রতি ঐতিহাসিক ইরফান হাবিবও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিস্তারিত দেখুনঃ ইরফান হাবিব, *সিন্ধু সভ্যতা*, কলকাতাঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., সেপ্টেম্বর ২০০৯, পৃ. ১১২-১১৬

৬। অনিরুদ্ধ দাস, *দীর্ঘস্থায়ী কৃষি বিকাশঃ ঐতিহাসিক পটভূমি ও আধুনিক সভ্যতার দায়*, কলকাতাঃ গাঙচিল, ২০১০, পৃ. ২৫

৭। অনিরুদ্ধ দাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

৮। Dines Chandra Sircar, *Select Inscriptions Bearing On Indian History And Civilization, Vol. I*, Calcutta: University of Calcutta, 1965, p. 79.

৯। এবনে গোলাম সামাদ, *বাংলাদেশঃ মানুষ ও ঐতিহ্য*, রাজশাহীঃ লেখক, ১৯৭৮, পৃ. ৬৭

১০। "Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan", *Epigraphia Indica Vol. XXI* (1931-32), New Delhi: Archeological Survey of India, p. 83-91

১১। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব*, কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৪

১২। Enamul Haque, *Chandraketugarh: A Treasure-house of Bengal Terracottas*, Dhaka: The International Centre for Study of Bengal Art, 2001, p. 316 & 317

১৩। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব*, কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৬

১৪। "পতঞ্জলী" ভারতকোষ- *চতুর্থ খণ্ড (দই- ফ্রেমিং)*, কলিকাতাঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৯১

১৫। পতঞ্জলি, *ব্যাকরণ-মহাভাষ্যঃ পস্পশাহ্নিক* (অনুবাদ ও সম্পাদনা দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম), কলিকাতাঃ আদ্যাপীঠ, ১৯২৫, পৃ. ১৯৮ ও ১৯৯

১৬। পুণ্ড্রবর্ধন ভ্রমণের বিবরণে উল্লিখিত হয়েছে- The soil is flat and loamy, and rich in all kinds of grain-produce. দেখুনঃ Samuel Beal, *Buddhist Records of The Western World, Vol. II*, London: Trubner & Co., Ludgate Hill, 1884, p. 194

১৭। জয়নাগের বপ্পঘোষবাট তাম্রলিপির দশম লাইনে এর উল্লেখ রয়েছে। দেখুনঃ *Epigraphia Indica Vol. XVIII* (1925-26), p. 63

১৮। লক্ষণসেনের আনুলিয়া তাম্রলিপির ৪র্থ ও ১০ম লাইনে এবং কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রলিপির ২৪ নম্বর লাইনে। দেখুনঃ Nani Gopal Majumdar (Ed. with Translation and Nots), *Inscription of Bengal, Volume III*, Rajshahi: The Varendra Research Society, 1929, p. 88-90 & 129

১৯। "আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্ । ফলৈঃ সংবর্ধয়ামাসুরুৎখাতপ্রতিরোপিতাঃ।।" ৩৭।। বঙ্গানুবাদঃ "ধান্যের চারাগুলিকে উঠাইয়া পুনরায় রোপন করিলে, সেগুলি যেমন ফলভরে মূল দেশ পর্যন্ত নত হইয়া শস্য দান করে, তেমনি বঙ্গীয় রাজারা রঘু কর্তৃক প্রথমে উন্মুলিত এবং পশ্চাৎ স্ব স্ব পদে স্থাপিত হওয়ারয়, রঘুর পাদপদ্মে নত হইয়া প্রচুর ধনদানে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিল ॥" ৩৭ ॥ ৪র্থ সর্গঃ, শ্লোক ৩৭। সূত্রঃ কালিদাস, *রঘুবংশম্* (মদগুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্যেণ সম্পাদিত), কলিকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭০ ও ১৭১

Scanned by CamScanner

২০। ঋষি পরাশর রচিত *কৃষি পরাশর*- এর মূখ্য বিষয় হলো কৃষি এবং তিনি সাত নম্বর শ্লোকে লিখেছেন ধান হতে অন্নের সৃষ্টি, ধান কৃষি কাজ ভিন্ন পাওয়া সম্ভব নয়। সূত্রঃ *Krsi-Parasara* (Edited and Translated by Girija Prasanna Majumdar and Sures Chandra Banerji), Calcutta: The Asiatic Society Calcutta, 1960

২১। সন্ধ্যাকর নন্দী '*রামচরিত*'তে উল্লেখ করেছেন (তৃতীয় পরিচ্ছদ শ্লোক নম্বর ১৭):

बहुधान्यराजसं(स)हतिसम्भावितकाम्यरूपया लक्ष्मया(क्ष्म्या) ।
सद्वंशास्तारि[त]या प्रस्फुरदिक्षाकुशेखराभरण[ा]म् ॥ १७ ॥

সূত্রঃ Mahamahopdhaya Haraprasad Sastri, "Ramacarita By Sandhyakara Nandi", *Memoirs Asiatic Society Of Bengal, Vol. III No. I*, Calcutta: The Asiatic Society of Bengal, 1910, পৃ. ৪৮

[B] (Varendri) which was (esteemed as) the sparkling crest-jewel of the earth because of (the presence of) Laksmi (Beauty) whose lovely form was beheld in the paddy plants of various kinds, which was further expanded by the fine bamboo clumps, and which had (as additional charm) the sugarcane plants that were flourishing excellently there. সূত্রঃ R. C. Majumdar, Radhagovinda Basak & Nanigopal Banerji, *The Ramacaritam of Sandhyakaranandin,* Rajshahi: The Varendra Research Museum, 1939, p. 91

বঙ্গানুবাদ, সেই পৃথিবী [বরেন্দ্রী] শিরোভূষণরূপে বিরাজ করিতেছিল। কারণ ইহার সম্পত্তির কমনীয় স্বরূপ বহুবিধ শ্রেষ্ঠ ধান্যরাশিতে উৎপ্রেক্ষিত ছিল এবং ইহা উত্তম বেনুসমূহ দ্বারা প্রসারিত ছিল, কিন্তু ইহা দীপ্তিযুক্ত ইক্ষুলতা শোভিত ছিল। সূত্রঃ জ্যোতি বিশ্বাস, *সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত: ঐতিহাসিক ও সমাজিক বিশ্লেষণ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮, পৃ. ১৪৪

২২। আলি নওয়াজ মনে করেন ৭ম শতাব্দীর পূর্বে এবং বাংলাপিডিয়ার তথ্য মতে ৮০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খনার বচনসমূহ রচিত হয়। বিস্তারিত দেখুনঃ আলি নওয়াজ, *খনার বচনঃ কৃষি ও কৃষ্টি*, ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ২০১৪, ৪২-৭৭; "খনা", http://bn.banglapedia.org/.

২৩। যেমনঃ খরা ভুয়ে ঢালবি জল, সারা বছর পাবি ফল॥; কাঁচা রোপা শুকায়, ভুঁইয়ে ধান ভুঁইয়ে লুটায়॥; ঘন সরিষা পাতলা রাই, নেংগে নেংগে কার্পাস পাই॥; সেচ দিয়ে করে চাষ, তার সবজি বার মাস॥; সরিষা বনে কলাই মুগ, বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক ॥; খনা বলে চাষার পো, শরতের শেষে সরিষা রো ॥ ষোলো চাষে মূলা, তার আধা তুলা। তার আধা ধান, বিনা চাষে পান ॥ দেখুনঃ *খনার কৃষি ও ফল সংক্রান্ত বচন*, ঢাকা: নারীগ্রন্থ প্রবর্তনা, ২০১১, ৭০ ও ৭৩; তুষার কান্তি পাণ্ডে (সম্পা.), *চাণক্য শ্লোক, সাতশ প্রবাদ ও খনার বচন*, কলকাতা: গ্রন্থনা, ২০০২, ৪৫

২৪। ক. ধান চাষের খবর দিয়েছেন- ১৫ শতকের শুরুতে রচিত '*য়িং-য়া শ্যাং-লান*' গ্রন্থের লেখক মা হোয়ান বা কুও ছুং-লি, ফেই শিন (১৪৩৬ খ্রি.) এবং মোঘল ঐতিহাসিক আবুল ফজল; খ. চাল রপ্তানীর তথ্য দিয়েছেন– মা হোয়ান বা কুও ছুং-লি, ভারতের কোচিনে আবস্থানরত পর্তুগীজ আমলা তোমে পিরেস (নভেম্বর ১৫১২ থেকে জানুয়ারি ১৫১৫ খ্রি.), ভেনিসীয় বাণক-পর্যটক সিজার ফ্রেডারিক (১৫৬৭ খ্রিষ্টাব্দ), ইংরেজ বণিক-পর্যটক রালফ ফিচ (১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দ), পর্তুগিজ পর্যটক সেবাস্টিয়ান মানরিক (১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ) এবং শায়েস্তা খাঁর আমলে (১৬৬৪-৭৭ খ্রি.) বাংলায় আগত ফরাসি পর্যটক ফ্রান্সিস বার্নিয়ার। সূত্রঃ সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানী, ২০০৫, পৃ. ৬১২, ৬১৩, ৬১৯, ৬৩৫, ৬৩৭; আবুল ফজল, *আইন-ই-আকবরী ও আকবরের জীবনী* (অনুবাদঃ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়), ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ,

Scanned by CamScanner

২০০৮, পৃ. ৯৩; ওয়াকিল আহমদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ঢাকাঃ বাতায়ন প্রকাশন, ২০১১, পৃ. ৪৩-৪৫, ৫০, ৫৭, ৫৯, ৩৪২, ৩৪৩; ইরফান হবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)*, কলকাতাঃ কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৯, পৃ. ৬০

২৫। ওয়াকিল আহমদ, *লোকজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তি*, ঢাকাঃ গতিধারা, ২০১০, পৃ. ২৮

২৬। "কৃষি", http://www.banglapedia.org/HTB/101116.htm, 7.56 AM, 03 May, 2014

২৭। "Engelberg, Inc.", Vintage Machinery, 2011, Retrieved July 17, 2011

২৮। এর পর The Engelberg Huller Company কোম্পানি তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করে। এরূপ একটি বিজ্ঞাপন ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে Dun's Review: International Edition (Pub. by R.G.Dun & Co., NY: USA) তে প্রকাশিত হয় (চিত্র ০২)। ২৮ তারা যন্ত্রটি মধ্য-আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ভারত, ফিলিপাইন, চীন, জাপান, রাশিয়া ও আফ্রিকাতে রপ্তানি শুরু করে। ১৪ মে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে *The Post-Standard* (Syracuse, New York)-এ প্রকাশিত এক খবর থেকে জানা যায় ভারত এবং ব্রাজিল থেকে এ কোম্পানি বড় অর্ডার পায়। সূত্রঃ "Patents for Engelberg Huller Co.", Directory of American Tool and Machinery Patents, 2011, Retrieved July 17, 2011; http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id= uc1.c2554754; view=1up; seq=62, 09.09, AM, 13 May, 2015; "Big Demand for Syracuse Goods", *The Post-Standard* (Syracuse, New York), 14 May, 1910

২৯। ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

৩০। ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

৩১। "মুগৈর" এবং "উঁচা 4", *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ২০০০

৩২। ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯

৩৩। *তদেব*

৩৪। ওয়াকিল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১; মুহম্মদ আবদুল জলিল, *লোকবিজ্ঞান ও লোকপ্রযুক্তি*, রাজশাহীঃ মোঃ আব্দুর রহমান মুহ্সেনী, ২০০৪, পৃ. ৩৮

৩৫। তপতী রানী সরকার, *বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারঃ অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর প্রভাব*, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০১৩, পৃ. ৯৪

৩৬। গীতটি রংপুর থেকে সংগৃহীত। সূত্রঃ "ধান ভানার গীত", *লৌকিক জ্ঞানকোষ* (ওয়াকিল আহমদ), ঢাকাঃ গতিধারা, ২০১১, পৃ. ২৬৮

৩৭। *আমাদের ধানের বৈচিত্র্যঃ একটি প্রাথমিক তথ্য চিত্র* ২০১০, ঢাকাঃ নয়াকৃষি আন্দোলন, উবিনীগ, ২০১০, পৃ. তৃতীয় প্রচ্ছদ

৩৮। এ বিষয়ে অভিধানের প্রধান সম্পাদক নিজেই ভূমিকাতে লিখেছেন– সময় ও প্রয়োজনীয় বই-এর অভাবে "কেবল নির্বাচিত বই পত্রই ব্যবহার করেছি। অনেক ক্ষেত্রে একজন লেখকের সবগুলো বইও ব্যবহার করার সুযোগ পাইনি। এর ফলে যে-শব্দটা প্রথমে ব্যবহার করেছেন, ধরা যাক আলাওল, সেটা আমরা হয়তো পেয়েছি ভারতচন্দ্রে।...কাজেই আমরা প্রথম ব্যবহারের যে সময় এবং দৃষ্টান্ত দিয়েছি, সেটা সব ক্ষেত্রে প্রথম ব্যবহারের হলপ-করা উদাহরণ নয়।" সূত্রঃ *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (প্রথম খণ্ড)*, ভূমিকা, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ২০১৩, পৃ. তেরো

৩৯। রামাই পণ্ডিত, *শূন্যপুরাণ (চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংকলন নিমাইচন্দ্র পাল)*, কলকাতাঃ বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯২

Scanned by CamScanner

৪০। জাহারাবী রিপন, *মধ্যযুগের পাঁচালি নাট্যে বাংলার কৃষি-প্রসঙ্গ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১০, পৃ. ৫২

৪১। "শূন্যপুরাণ" http://www.banglapedia.org/HTB/105683.htm, 7.32 PM, 23 September 2014.

৪২। "ঢেঁকি", *বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (দ্বিতীয় খণ্ড)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, নভেম্বর ২০১৩

৪৩। "পুয়া" *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান: দ্বিতীয় খণ্ড*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯

৪৪। "নারদ", *পৌরাণিক অভিধান* (সুধীরচন্দ্র সরকার সংক.), কলিকাতা: এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি., ১৪১২ বঙ্গাব্দ

৪৫। *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (দ্বিতীয় খণ্ড)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৪

৪৬। শাহানারা হোসেন, "সদুক্তিকর্ণামৃতে বাংলার গ্রাম", *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*, রাজশাহী: আবিএস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২, পৃ. ১০২ ও ১০৩

৪৭। Zulekha Hakue, *Terracotta Decorations of Late Mediaval Bengal Portayal of a Society*, Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1980, পৃ. ৬১।

৪৮। ইরফান হবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭০৭)*, কলকাতা: কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯৯, পৃ. ১১০; http://sites.asiasociety.org/princesandpainters/ tashrih-al-aqvam-album/, 7.50 PM, 23 September 2014

৪৯। "প্রবাদ", *লৌকিক জ্ঞানকোষ* (ওয়াকিল আহমদ), ঢাকা: গতিধারা, ২০১১, পৃ. ৩৪৩, ৩৪৪

৫০। তদেব

৫১। *বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান (প্রথম খণ্ড)*, ভূমিকা, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৩

৫২। "Baigram Copper-Plate Inscription of The (Gupta) Your" *Epigraphia Indica Vol. XXI* (1931-32), New Delhi: Archeological Survey of India, p. 83

৫৩। তপতী রানী সরকার, *বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার: অনার্যভাষী জনগোষ্ঠীর প্রভাব*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০১৩, পৃ. ৯৪; রফিকুল ইসলাম, "বাংলা ভাষায় অনার্য শব্দ", *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৩৮, সংখ্যা ৩, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৬৩; "ঢেঁকি, ঢেঁকী" *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩

৫৪। "ঢেঁকি, ঢেকী", *প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান: প্রথম খণ্ড*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৭

৫৫। "গার্হস্থ্য দ্রব্য-সামগ্রী", Husking pedal, *তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ* (সংকলন ও সম্পাদনা কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য), কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০০৬

৫৬। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, "প্রাক্ কথন", *তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০ ও ৩১

৫৭। J. Przyluski, Jules Bloch and Sylvain Levi, *Pree-Aryan and Pre-Dravidian in India* (Translate into English by P C Bagchy), Calcutta: Calcutta University Press, 1929, P. XXIV; মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, জানুয়ারি ২০১০, পৃ. ৫৭; "চাওলে", ক্ষুদিরাম দাশ, *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮

৫৮। তপতী রানী সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

৫৯। "উলাও", *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংকলন ক্ষুদিরাম দাশ), প্রাগুক্ত, ১৯৯৮

Scanned by CamScanner

৬০। "ভুসী" ও "সলা", *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংকলন ক্ষুদিরাম দাশ), *প্রাগুক্ত*, ১৯৯৮
৬১। তপতী রানী সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৮
৬২। "গড় ২", *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংকলন ক্ষুদিরাম দাশ), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮
৬৩। তপতী রানী সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯
৬৪। তদেব, পৃ. ৫৮
৬৫। "পাড়ন", *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংকলন ক্ষুদিরাম দাশ), *প্রাগুক্ত*, ১৯৯৮
৬৬। তপতী রানী সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০
৬৭। "উখুড়", *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংকলন ক্ষুদিরাম দাশ), *প্রাগুক্ত*, ১৯৯৮; "গার্হস্থ্য দ্রব্য-সামগ্রী", Husking mortar, *তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ* (সংকলন ও সম্পাদনা কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য), কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০০৬
৬৮। "আড়া-আড়ি", *সাঁওতালি বাংলা সমশব্দ অভিধান* (সংক. ক্ষুদিরাম দাশ), *প্রাগুক্ত*, ১৯৯৮
৬৯। রফিকুল ইসলাম, "বাংলা ভাষায় অনার্য শব্দ", *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৩৮, সংখ্যা ৩, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৬৪
৭০। অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭ (১৩৮৩), পৃ. ২৪; সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা*, কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৪, পৃ. ৭৬
৭১। সুকুমারী ভট্টাচার্য, *প্রাচীন ভারত*, কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ২০০৯, পৃ. ১১; অতীন্দ্র মজুমদার, *মধ্য ভারতীয়-আর্য ভাষা ও সাহিত্য*, কলিকাতা: নয়া প্রকাশ, ১৪০৪, পৃ. ৩
৭২। রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস প্রথম খণ্ড [প্রাচীন যুগ]*, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯২, পৃ. ২৪; আবদুল মমিন চৌধুরী, "বাংলায় ইসলাম-বিস্তারের পটভূমি", *বাংলাদেশ এশিয়াটি সোসাইটি পত্রিকা*, চতুর্থ খণ্ড, ডিসেম্বর ১৯৮৬, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৬, পৃ. ৬২
৭৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮; আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, মার্চ ২০১২, পৃ. ৯৯
৭৪। নীহাররঞ্জন রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২; অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৭, পৃ. ২৬
৭৫। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, "প্রাক্ কথন", *তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ* (সংকলন ও সম্পাদনা কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য), কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০০৬, পৃ. ৩১
৭৬। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য, "প্রাক্ কথন", *তরাই-ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ* (সংকলন ও সম্পাদনা কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য), কলকাতা: প্যাপিরাস, ২০০৬, পৃ. ৩০
৭৭। রবিউল হুসাইন, "বাংলাদেশের লোকজ স্থাপত্য ও গৃহনির্মাণ", *বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য (দ্বিতীয় খণ্ড, শামসুজ্জামান খান সম্পাদিত)*, পৃ. ২৫৯

* নওগাঁ, পাবনা, যশোর ও ভোলা জেলার আঞ্চলিক শব্দসমূহ সংগ্রহীত হয়েছে যথাক্রমে জনাব হামিদা খাতুন (৬৯), মালাহার, ধামইরহাট, নওগাঁ; জনাব ছালেহা খাতুন (৭০), উত্তর শোলাবাড়িয়া সাঁথিয়া, পাবনা; জনাব লীলাবতী সরকার (৬৬), খাকুন্দি, মণিরামপুর, যশোর এবং জনাব আবুল বাশার (৫০), আছলামপুর, চরফ্যাসান, ভোলা-এর নিকট থেকে। তারিখ: ২-২০ সেপ্টেম্বর ২০১৪ খ্রি.।

Scanned by CamScanner